পঞ্চম অধ্যায়

মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) :

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য মনোমোহন বসু তাঁর নাট্যধারা গীতাভিনয়ে দেশীয় যাত্রার আঙ্গিককে যেমন রপ্ত করেছেন নাটকের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বহু প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনিকে বেছে নিয়েছেন। আধুনিক নাটকের অঙ্গনে তাঁর গীতাভিনয়গুলি ব্রাত্য বলে সমালোচিত হলেও একথা অনস্বীকার্য যে নতুন ও পুরাতনের সংযোগে সাধারণ জনগণের মধ্যে নাটকের গ্রহণযোগ্যতাকে বাড়িয়ে তুলেছিল ইংরেজী শিক্ষানবিশদের নাট্যচর্চার গন্ডি অতিক্রম করে। তাঁর নাটক বা গীতাভিনয়গুলিতে কেবল গীতের বাহুল্যই নয়, কৃত্তিবাস কাশীরামের দৌলতে বহুপ্রচলিত রামায়ণ মহাভারতের চরিত্র এবং অন্যান্য পুরাণের চরিত্রগুলি আধ্যাত্মিক সত্তা পরিহার করে মানবীয় হয়ে উঠেছে বা আরো স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে বাঙালির বাস্তব পটভূমিতে নির্মিত হয়েছে। আর এখানেই অন্বেষণ করতে হবে তাঁর নাটকে মহাভারত কাহিনির বিবর্তন কতটা সমকালীন হয়ে উঠেছে।

মনোমোহন বসুর পৌরাণিক নাটকের বিষয় ও চরিত্র সম্পর্কে নাট্যসমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন -

> ''পৌরাণিক বিষয়-বস্তু লইয়া নাটক রচনা করিলেও মনোমোহন তাহাদের মধ্য দিয়া কোনো আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশ করিতে যান নাই-মানবিক রসই তাঁহার নাটকের প্রধান উপজীব্য এবং ইহার মধ্যে করুণ রসই প্রধান। . . . পূর্ববর্তী যুগের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে দেবচরিত্রসমূহ ইহাদের স্বাতন্ত্র্য কতকটা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু মনোমোহনের নিকটই ইহাদের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া মানব চরিত্রের সমধর্মী হইতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাদের পরিচয় পৌরাণিক; কিন্তু ইহাদের আচরণ বাঙালীর চরিত্র-সুলভ হইয়া উঠিয়াছে।''[১]

তাঁর ‘সতী নাটক’ (১৮৭৩) ও ‘পার্থ পরাজয়ে’ (১৮৮০) মহাভারতীয় বীজ বঙ্গভূমির নতুনযাত্রায় সুরলালিত্যে যেভাবে বর্ধিত হয়েছে সে সমন্ধে সমালোচকের উপরোক্ত ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদন-গিরিশচন্দ্রের মতো যাঁরা পুরাণকে তাঁদের নাটকের অন্যতম বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করেছেন তাঁদের মতো মনোমোহন বসুও আশৈশব রামায়ণ মহাভারতের প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। প্রবোধচন্দ্র বসু মনোমোহন বসুর জীবনীতে জানিয়েছেন -

> ‘‘শুনিয়াছি সেই অল্পবয়সেই তিনি গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার ফরমাইস মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনার দ্বারা তাঁহাদের মন হরণ করিতেন, গ্রামবাসীরা অর্দ্ধউলঙ্গ শিশুর মস্তকে পাগড়ী বাঁধিয়া দিয়া শিশুনিঃসৃত অর্দ্ধোচ্চারিত রামায়ণ মহাভারত আবৃত্তি গাথা পরম আনন্দ ও ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিতেন।’’[২]

হিন্দুমেলার অন্যতম কর্ণধার মনোমোহন বসু বাঙালির স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত করতে পুরাতনের অনুবর্তন করেছেন। তিনি মহাকাব্যের সুবিশাল পরিধির মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আনুসন্ধান করেছেন এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও এই পথেই নিজেদের শিকড় খুঁজে পেয়েছিলেন। চৈত্র মেলার দ্বিতীয়বর্ষের বক্তৃতায় তিনি ঐতিহ্যানুসন্ধানে সুদূর মহাভারতের উল্লেখ করেন -

> ‘‘বিশেষতঃ এদেশে এ অনুষ্ঠান নূতন নহে। প্রকৃত ইতিহাস বিরহে বহু পূর্ব্বের কোনো বিশেষ বিবরণ জানিতে আমরা বঞ্চিত আছি, তথাপি মহাভারতে বর্ণিত রাজ-চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান বৃত্তান্ত এবং পুরাণোক্ত তদ্বৎ অন্যান্য যজ্ঞ বিবরণ পাঠে বিলক্ষণ জানা যায়, যে পূর্ব্বকালেও এই বহু বিস্তৃত ভারত ভূমির পুণ্যবান লোকেরা সর্ব্ব জাতির একত্র সমাবেশ এবং সর্ব্ব দেশের দ্রব্যজাত প্রদর্শনের যে যে মহাফল, তাহার মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। . . . নানা স্থানীয় গুণীজনের অধিষ্ঠান দ্বারা পান্ডিত্য, কবিত্ব, বাগ্মীতা, কারুকার্য, চিত্র নৈপুন্য, সঙ্গীতাদি অশেষবিধ বিদ্যার প্রসঙ্গ এখন যে রূপ, তখনও সেই রূপ বা কোন কোন বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর ছিল।’’[৩]

ইংরেজি বা সংস্কৃত নাটকের অনুকরণ না করে মনোমোহন বসু তাঁর নাটককে দেশজ রীতিতে পরিবেশন করেছেন। প্রচলিত যাত্রার আঙ্গিকে গানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে যে গীতাভিনয়ের সৃষ্টি করলেন তা একদিকে যেমন আধুনিক নাটকের নিকটবর্তী হল আবার যাত্রার নিম্ন রুচিকেও পরিহার করতে সমর্থ হল। 'মধ্যস্থ' পত্রিকার সম্পাদক যাত্রা ও নাটকের মধ্যবর্তী স্তরে যে নতুন পথে হাঁটলেন তা সমকালীন সাহিত্যসৃষ্টির পরিপূরক। মনোমোহন বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরিতে এই বিষয়ে তাঁর দক্ষতার উল্লেখ করেছেন সুনীল দাস -

> ''বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু যদি সদর রক্ষা করিয়া থাকেন, কবি মনোমোহন খিড়কি-দ্বার রক্ষা করিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে। যাত্রাগান, পাঁচালী ও হাফ আখড়াই প্রভৃতি রচনায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। বস্তুত নিধুবাবু দাশরথি রায় প্রভৃতির পর বাংলা দেশের উল্লেখযোগ্য লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র তিনিই ওই জাতীয় রচনার রেওয়াজ পূরামাত্রায় বজায় রাখিয়াছিলেন''[৪]

সতী নাটক (১৮৭৩) :

প্রজাপতি দক্ষ ও সতীর আখ্যান কালিকা পুরাণ, শিবপুরাণ, বায়ুপুরাণ, দেবী ভাগবত, হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত -ইত্যাদি পুরাণগুলিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন পুরাণে মতভেদ থাকলেও শিব অবমাননার লক্ষ্যে দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগ সমন্ধে বিতর্কের অবকাশ নেই। এই সাধারণ তথ্যটিকে সামনে রেখেই নাট্যকারগণ তাঁদের নাটক রচনা করেছেন। মনোমোহন বসুর 'সতী নাটক' ও পরবর্তী কালে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'দক্ষযজ্ঞ'-দুটি নাটকই পৌরাণিক এই আখ্যান অবলম্বনে রচিত। পুরাণের বহুবিস্তৃত দক্ষযজ্ঞের বিবরণ মহাভারতে পুঙ্খানুপুঙ্খ না থাকলেও কয়েকটি পর্বে এর উল্লেখ রয়েছে। যদিও নাট্যকারদ্বয় সরাসরি মহাভারতের অনুসরণে তাঁদের নাটক দুটি রচনা করেননি তবু পুরাণ কাহিনির সঙ্গে মহাভারতের সাদৃশ্য নাটক দুটিকে আলোচ্য গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করে।

মহাভারতে দ্রোণপর্ব, শল্যপর্ব ও শান্তিপর্বে দক্ষ-সতী-শিব সংক্রান্ত যে সকল তথ্য পাওয়া যায় সেগুলিকে ক্রমান্বয়ে লক্ষ্য করলে পুরাণ কাহিনির একটি প্রতিরূপ পাওয়া যায়। দ্রোণপর্বের শেষে ব্যাসদেব অর্জুন কছে রুদ্রমাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়ে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের যে বর্ণনা দেন -

> ''দক্ষরাজ যজ্ঞের সমুদয় সামগ্রী আহরণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহাদেব কুপিত ও নির্দ্দয় হইয়া তাঁহার যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া বাণপরিত্যাগপূর্ব্বক ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সুরগণ কেহই শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা মহেশ্বরকে কুপিত ও সহসা যজ্ঞ বিনষ্ট করিতে দেখিয়া এবং তাঁহার জ্যানির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।''[৫]

আবার, মহাভারতের শান্তিপর্বে জনমেজয়ের অনুসন্ধানী জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে বৈশম্পায়ন কর্তৃক ''শিবহীন দক্ষযজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণে''[৬] 'সতী নাটকে'র সঙ্গে পৌরাণিক যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে প্রস্তাবনা অংশে নট-নটীর দ্বারা বিষয় নির্বাচন ও গুণ কীর্তনের মাধ্যমে নাটকের সূত্রপাত। শাস্ত্রোক্ত কোনো অসামান্যা পতিব্রতার গুণগান করা প্রসঙ্গে সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, শচী, রতি –এঁদের কথা উঠলেও মনোনীত হয় না। নটনটীরা এমন কোনো অনুপমা পতিপ্রাণার মাহাত্ম্য অন্বেষণ করছেন যা শুনলে 'বিদেশীর আশ্চর্য্য, স্বদেশীর ভক্তি, বালিকার শিক্ষা, যুবতীর চৈতন্য, বৃদ্ধার অনুতাপ হবে।' বলাবাহুল্য নাট্যকারের অভিপ্রায়ই নটের উক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে।

শিবের মাহাত্মকে প্রাধান্য দিতে বৈষ্ণব ও শৈব দ্বন্দ্বের নেপথ্যে উনবিংশ শতকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অধপতিত অবস্থার প্রতি ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন ভাবে ক্রিয়াশীল। বৈষ্ণব শৈবকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে বলেছেন নগরপালকে। নাটকের প্রয়োজনে সৃষ্ট নগরপাল বা সভাপাল চরিত্র অবিবেচক নন। প্রথম দৃশ্যেই সম্ভাব্য দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত এবং দক্ষের প্রতি শিবের অশিষ্ট আচরণের শুধু উল্লেখই নয়, ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন সভাপাল। ইতিপূর্বে ভৃগুযজ্ঞে

দক্ষকে দেখে সকল দেবতা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, কেবল ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ছাড়া। ব্রহ্মা পিতা, বিষ্ণুর সঙ্গে দক্ষের কোনো বিশেষ বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু শিব জামাতা। সুতরাং শিবের কাছ থেকে স্বাভাবিক সম্মান তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন। তাই শিবকে অবমাননার লক্ষ্যে দক্ষ যজ্ঞের আয়োজন করেছেন যেখানে শিব অনিমন্ত্রিত থাকবেন। দক্ষের এহেন সিদ্ধান্তের জন্য মহাভারতে দধীচি মুনি তাঁর তীব্র সমালোচনা করেন এবং যজ্ঞ পন্ড হওয়ার কথা বলেছেন, ''অতএব যখন তুমি তাহাকে নিমন্ত্রণ কর নাই, তখন নিশ্চয়ই তোমার এই যজ্ঞ বিনষ্ট হইবে।''[৭] নাটকে দধীচি মুনির নাম উল্লেখ থাকলেও প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত নেই। কিন্তু নারদ চরিত্রকে নাট্যকার বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছেন। বস্তুত নারদ চরিত্রের মধ্যে বহুবিধ নাটকীয় উপাদান, হাস্যরস এবং কলহপ্রিয়তা নাট্যামোদীদের খুবই পছন্দের বিষয়। নারদ দক্ষের অভিপ্রায়কে সাধুবাদ জানান। তিনি প্রকাশ্যে শিবের সমালোচনা করলেও আসলে যে স্তুতিবাদই করেন তা স্বগতোক্তির মধ্যমে মাঝেমাঝে বুঝিয়ে দেন। শিব ব্যতীত ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করার ভার নারদের উপরই দিয়েছেন দক্ষ। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই নারদীয় কর্মকান্ডের সম্ভাব্যতা অনুমান করে নাট্যদর্শকের মনেও পুলক জাগে।

দক্ষের স্ত্রী প্রসূতিকে মহাভারতে দেখা না গেলেও অন্যান্য পুরাণে উল্লেখ রয়েছে। কন্যা সতীর প্রতি তাঁর অত্যাধিক স্নেহবাৎসল্যের সাদৃশ্যে উমা-মেনকার সম্পর্কের কথা অনিবার্য ভাবে মনে পড়ে। নাটকে প্রসূতির আক্ষেপ, 'হায় আমার পাগল জামাই, যতবার আন্তে পাঠাই, পাঠান না! ভাবলেম এবার এই যজ্ঞের উৎসবে না পাঠিয়ে থাকতে পারবেন না। বিধাতা সে সাধেও বাদ সাধলে।'(১/২) প্রসূতি ও দক্ষের পারস্পরিক দ্বন্দ্বটি অত্যন্ত সুন্দর নাটকীয় সংলাপে ব্যক্ত হয়েছে –

প্রসূতি : তুমি যদি গর্ভে ধর্ত্তে, তবে জান্তে, মা হওয়ার কি জ্বালা?

দক্ষ : তুমিও যদি পিতা হতে, তবে জান্তে, অপমানিত শ্বশুর হওয়ার কি জ্বালা! (১/২)

প্রসূতি দক্ষকে নিন্দা ব্যঙ্গে জর্জরিত করেন। কেননা দক্ষ নিজের স্ত্রী সন্তানকে সুখী করতে পারেন না। তিনি যজ্ঞ করে ত্রিভুবনের লোককে তুষ্ট করবেন, তা দুরাশা মাত্র। সতীকে নিয়ে

আসার জন্য তিনি নারদকে কৈলাসে পাঠান। মহাভারতে দধীচি ধ্যানযোগে কৈলাসে নারদের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেন, ''মহাত্মা নারদ হরপার্ব্বতীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন।''[৮] প্রসূতির কথা অমান্য করতে পারেন না এমন ভাব দেখিয়ে নারদ শিবের কাছে যজ্ঞের কথাটি ইনিয়ে-বিনিয়ে যেন মুখ ফসকে বলেই ফেললেন। এটাই নারদীয় স্টাইল। নাট্যকার প্রসূতির নির্দেশ ক্রমে নারদকে কৈলাসে পাঠালেও একথা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, নারদ শিবকে সংবাদ না দিয়ে থাকতে পারতেন না। মহাভারতের আদিপর্বে সমুদ্রমন্থনের সংবাদটি নারদ স্বতস্ফুর্ত ভাবেই কৈলাসে গিয়ে শিব-পার্বতীর কাছে ব্যক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে মহাভারতের সমালোচক নারদের দরদী মনের অস্তিত্ব অনুভব করেন, ''রত্নাকর সমুদ্র থেকে নানাবিধ বস্তু উঠছে, দেবতারা এটা-ওটা ভাগ করে নিচ্ছেন–এই অবস্থায় ভোলানাথ শিবের জন্য বড়োই দুঃখ হল নারদের।''[৯]

কাশীরামে নারদ শিবকে উদ্দেশ্য করে পার্বতীকে বললেন–

''স্বর্গমর্ত্য পাতালে আছয়ে যত জনে
সবে ভাগ পাইল কেবল তোমা বিনে।।
তোমারে না দিয়া ভাগ সবে বাঁটি লৈল।
এই হেতু মোর চিতে ধৈর্য্য নাহি হৈল।।''[১০]

নাটকে নারদের সংবাদ প্রেরণ ও সমুদ্রমন্থনের বার্তা এ দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে বলেই নির্বিকার ভোলানাথের ঔদাসীন্যে পার্বতী তাঁর পূর্বজন্মের কথা ব্যথিত মনে স্মরণ করেন–

''জানিয়া উহারে দক্ষ পূজা না করিল।
সেই অভিমানে তনু ত্যজিতে হইল।।''[১১]

নাটকে ভক্তিরসের আমদানী করতে নাট্যকার নারদের চেলা রূপে শান্তিরাম চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। নারদ শিবের কাছে পরিচয় দিয়েছেন, 'এঁর নাম শান্তিরাম; নিষ্ক্রিয় ভাবুক, প্রকৃত ভক্ত, বিরক্ত বৈষ্ণব, প্রলাপী শৈব, দরিদ্র সেবক!'(২/১) আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় শান্তিরাম চরিত্রটি সৃজনে নাট্যকারের প্রশংসা করেছেন-

''নারদের শিষ্য শান্তিরামের চরিত্রটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে, ইহা নাট্যকারের মৌলিক সৃষ্টি। গীতাভিনয় এবং কোন কোন পৌরাণিক নাটকের মধ্যে যে বিষয় বন্ধনহীন তত্ত্বদর্শী এক-একটি পাগল কিম্বা পাগলিনী স্ত্রীর চরিত্র পরিকল্পিত হইত, ইহার মধ্যেই তাহার সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। শান্তিরাম ছড়া ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়া সুগভীর তত্ত্বকথা প্রকাশ করিয়াছে। কোন কোন গীতাভিনয়ের মধ্যে সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বপরিবেশনের যে একটি দায়িত্ব থাকে, ইহার মধ্যে এই চরিত্রটির ভিতর দিয়াই তাহা পালন করা হইয়াছে। নিতান্ত হাল্কা ছড়ার মধ্য দিয়া নাট্যকার এই তত্ত্বকথা সাধারণের চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন ইহা তাঁহার কম কৃতিত্বের কথা নহে।''[১২]

দক্ষ যজ্ঞের কথাটি শান্তিরামের হেয়ালি গানে ফস্ করে প্রকাশ হয়ে যায় সতীর কাছে। নাট্যকার নারদের মুখে আপাত লাগাম টেনেছেন বটে কিন্তু শান্তিরামের প্রলাপী গানে নারদের অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হয়- 'যাগ দেখতে বাপ্ ঘরেতে/ মায়ের যেতে হবে যখন।'(২/২) 'যাগ দেখতে' শোনা মাত্র সতী নারদকে চেপে ধরলে শান্তিরাম যজ্ঞের কথাটি স্পষ্ট করে প্রকাশ করেন। দক্ষের প্রতি সতী ক্ষোভ অভিমানে নিজেকে আত্মধিক্কার দিতে থাকেন, কেননা এত বড়ো যজ্ঞে শিব ব্যতীত ত্রিভুবনের সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। নারদ মাতা প্রসূতির কথা উল্লেখ করে সতীকে সান্তনা দানের চেষ্টা করেন। নারদীয় উপশমকারী বাক্য সতীর মনকে তরলিত করতে অব্যর্থ হয়।

নারদ : প্রসূতি তোমায় না পেলে প্রাণ ধারণ কর্ব্বেন না। তুমি সচ্ছন্দে মার কাছে যাও।

সতী : পিতা ত্যাগ কল্লেন, মার কি সাধ্য? আমি বিনা নিমন্ত্রণে যাব; আমার শঙ্করের অপমান হবে, তাও কি প্রাণে সয় রে নারদ?

নারদ : পিত্রালয় তো আবদারের স্থান, সেখানে যেতে আবার নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ কি? তোমায় দেখলে কি আর প্রজাপতির সে ভাব থাকবে? একটু লঘুত্ব স্বীকার কল্লে যদি সব দিক রক্ষা পায় . . . (২/২)

নাটকে সতীকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমত, নারদ ও শান্তিরাম কৈলাসে পৌঁছে যখন সতীর কাছে খাদ্যবস্তু আবদার করেন তখন সতীর ভূমিকা জগৎমাতার।

পাগলা শান্তিরাম তাই বগল বাজিয়ে নাচতে নাচতে গান করেন -

'হায় কি কপাল, হায় কি কপাল;
বাপ্ চেয়ে মা এমন দয়াল!
বাপের কাছে চেয়ে পাই;
না চাইতে মা দিলেন ঠাঁই।'(২/২)

দ্বিতীয়ত, যজ্ঞে অনাহূত বলে পিতা দক্ষের প্রতি অভিমানী কন্যা রূপে তাঁকে দেখা যায় এবং নিজেকে ভাগ্যহীনা মনে করে প্রাণ বিসর্জনের কথাও উল্লেখ করেন। আবার মাতার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও পিতৃস্নেহের উপর ভরসা করে তিনি সান্তনা পান। সর্বোপরি স্বামীর মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারেন। এছাড়াও এক ঝলকের জন্য সতীর সলজ্জ মুখটি নাটকে একবার দেখা যায়।

শিব : বাল্যে পিতা, যৌবনে ভর্ত্তা, বার্দ্ধক্যে পুত্র –অবলাগণের গতি।

সতী : নাথ! আমার যে বাল্যই মনে পড়ে! (সলজ্জা) অন্য কাল যে কবে হলো, তা তো কিছুই জানিনে।(৩/১)

যজ্ঞের ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ করে সতীর স্নেহ বাৎসল্য আকাঙ্খাকে নাটকে বড়ো করে দেখানো হয়েছে। মাকে দেখবার জন্য তাঁর প্রাণ ব্যকুল হয়ে উঠেছে। শিবকে অত্যন্ত নমনীয় রূপে দেখা যায়। তিনি যজ্ঞের কথা শুনে ক্রোধী হয়ে যাননি বরং সতীকে সান্তনা দান করেছেন। আবার সতীর অত্যাধিক ব্যাকুলতার প্রতি মৃদু কটাক্ষ করে বলেন, 'সেই বাবা, যিনি তোমায় ছেড়ে–তোমার শিবকে ছেড়ে ত্রিলোক নিয়ে যজ্ঞ কর্চ্ছেন? তবে প্রিয়ে অপমান আর বাইরে নয়, ঘরেই হয়!'(৩/১) নাটকে পৌরাণিক পরিমন্ডল সৃজনের পরিবর্তে সাধারণ বাঙালি পরিবারের প্রতিচ্ছবিই ফুটে উঠেছে। সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, ''দক্ষের সংসার যেন বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘর।''[১৩]

মহাভারতে দক্ষযজ্ঞে শিবের নিমন্ত্রণ না হওয়াতে সতীকে দুঃখিত হতে দেখা যায়। কীভাবে দান বা তপানুষ্ঠান করলে শিব যজ্ঞের অর্ধেক বা তৃতীংশ লাভ করতে পারবেন স্বামীর কাছে

তা জানতে চেয়েছেন। শিব সতীর বাক্যে ইন্দনিত হয়ে নিজের ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য–

> ''মুখ হইতে এক ভয়ঙ্কর পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। ঐ বীরই বীরভদ্রনামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছেন। বীরভদ্র মহেশ্বরের মুখ হইতে বহির্গত হইবামাত্র দেবদেব তাঁহাকে কহিলেন, তুমি অবিলম্বে প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট কর।''[১৪]

নাটকে যজ্ঞ প্রাধান্য পায়নি। সতীর আখ্যান বর্ণনা করাই নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য, তা তিনি শুরুতেই নটের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে কতগুলি রূপক চরিত্র সংযোজন করে সতীর মনের অবস্থা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। সতীর দক্ষালয়ে যাওয়ার পথসঙ্গী হতে পুষ্কর মেঘ, পবন, কুবের -এঁরা এসেছেন। মেঘ ছায়া দিয়ে, পবন বাতাস দিয়ে তাঁর যাত্রাপথকে মসৃণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু তাতে তো আর সতীর অন্তরের জ্বালা জুড়াবে না তাই তিনি তাদের সকলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কুবের ধনরত্ন দিয়ে সাজিয়ে দিতে এলে শিবানুচর নন্দীই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। নন্দীর কথার ভক্তিরস নাট্যদর্শকদের হৃদয় প্লাবিত করে, 'মার অঙ্গে অলঙ্কার দিলে যেন আমাদের মা আর থাকবেন না, যেন–যেন–যেন কুবেরের মা, যেন মাতলির মা, যেন বৈকুণ্ঠের সেই মার মত হয়ে উঠবেন। মায়ের পায়ে একটি চন্দন মাখা জবা ফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে দিলে যত শোভা হয় আলঙ্কারে তা হয় না।'(৩/২)

অশ্বিনী, অশ্লেষা ও মঘা নামে তিন দিদি দক্ষালয়ে যাওয়ার পথে সতীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর দুঃখ আরও বাড়িয়ে দেয়। নিজেদের সুখ সচ্ছলতার সঙ্গে সতীর দারিদ্রের তুলনা করে ব্যঙ্গ করে। তাদের তির্যক চাপা সংলাপ নাট্যগুণ সমৃদ্ধ।

মঘা : দেব সভা, গন্ধর্ব্ব সভা রাজর্ষি রাজচক্রবর্ত্তীদের সভা হবে, তার মাঝে বলতে কি – পঞ্চানন ঠাকুর যে সাজগোজে ফেরেন!

সতী : এই সব পরিহাস, এই সব শ্লেষ, এইরূপ ঘৃণা, এতদূর কাঠিন্য, এতটা তাচ্ছিল্য এও প্রাণে সহ্য হয়?

মঘা : (অশ্লেষার প্রতি জনান্তিকে) তবু যদি বুড়ো না হতো!

অশ্লেষা : (মঘার প্রতি) আর যদি দশখানা দিতেথুতে পার্ত্তো!

অশ্বিনী : এর চেয়ে এখানে না আসাই ভাল ছিল!

অশ্লেষা : গয়না টয়না কিছু আছে? (নিস্তব্ধ দেখিয়া) তা নেই নেই, তার জন্য ভাবনা কি? সাতাশ জন আছি, এক এক খানা খুলে দিলে গায়ে ধর্ব্বে না?

. . . . . .

অশ্বিনী : সতি! সে কি? বলদের রথে যাবে কেন? আমাদের দিব্য রথ আছে। সব ভগ্নী এক সঙ্গে যাব! (৩/২)

দক্ষের কন্যাদের উল্লেখ মহাভারতেও পাওয়া যায়। তিনি তাঁর ২৭টি কন্যা চন্দ্রকে দান করেছিলেন। শল্যপর্বে জনমেজয় বৈশম্পায়নের কাছে দক্ষের শাপে চন্দ্রের যক্ষারোগাক্রান্তের কারণ এবং শাপমুক্তির কথা জানতে চাইলে তিনি যে আখ্যান বর্ণনা করেন, ''প্রজাপতি দক্ষ স্বীয় সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রকে দান করেন। ঐ সমস্ত অলোকসামান্যা রূপলাবণ্যসম্পন্না বিশাললোচনা কন্যার মধ্যে রোহিণী সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ছিলেন।''[১৫] নাট্যকার দক্ষকন্যা মঘা-অশ্লেষার ঈর্ষাপরায়ণতা ও ঝগড়াঝাটির যে চরিত্র রূপায়ণ করেছেন তা একান্তভাবেই বাঙ্গালি ঘরের।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে প্রসূতি দ্বারবন্ধ ঘরে সতীর জন্য বিলাপ করতে করতে শোকে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। প্রধানা মহিষী ব্যতীত যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না। রামায়ণে রামচন্দ্রকে সীতার অবর্তমানে স্বর্ণসীতা নির্মাণ করে যজ্ঞ কর্ম সম্পাদন করতে দেখা যায়। দক্ষ রাজ প্রবল আত্মম্ভরিতায় বিকল্প প্রসূতীর কথা উচ্চারণ করেন -

> 'মান গেল– সম্ভ্রম গেল– দর্প গেল– তেজ গেল– রাজ্য গেল– সম্পদ গেল– আর কেউ নাম কর্ব্বে না– আর কেউ কুশাগ্রেও স্পর্শ কর্ব্বে না– আর কেউ প্রজাপতি রাজর্ষি বলে মানবে না! . . . দেখি তপোবলে নূতন প্রসূতি জন্মে কি না?'(৪/১)

উৎসবের আনন্দ নয় যজ্ঞের ছুতোয় মা বাপ আর জন্মভূমি দেখতে চাওয়ার বাসনায় উনবিংশ শতকের নারীর অন্তর্বেদনার সুর সতীর কান্নায় মিশে গেছে। মা ও মেয়ের কথপোকথনের মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অসহায়ত্বের যন্ত্রণা ফুটে ওঠে। পতির অনুমতি বিনা বাপের বাড়িতে না আসতে পারার কথাও তাদের সংলাপে ধরা পড়ে। নাটকে সতী শিবের সঙ্গে অনেক বাক্‌বিতণ্ডার দক্ষালয়ে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছেন। পৌরাণিক কাহিনিতে অবশ্য শিবের অনুমোদনের কথা নেই। ''মহাদেব অনুমতি না দিলেও সতী স্বামীর বাক্য উপেক্ষা করে পিত্রালয়ে উপস্থিত হন।''[১৬] নাটকের শেষে অবশ্য সতীকে যেতে না দেওয়া কাতর অনুরোধের মতোই শোনায়। শিবের কণ্ঠে শোনা যায় রোমান্টিক নায়কের স্বর, 'সতি তুমি যেও না, যেও না, যেও না, অনলে পতঙ্গ হতে যেও না।'(৫/১)

আবেগঘন এই দৃশ্যের পর কমিক রিলিফ সৃষ্টি করতে পরবর্তী দৃশ্যে শিবানুচর নন্দী, শান্তিরাম, বৈরাগীর দক্ষপুরীতে আগমন ঘটে। মহাভারতে শিবের ক্রোধ থেকে উৎপন্ন বীরভদ্রকে যজ্ঞপণ্ড করতে দেখা যায়। কিন্তু নাটকে নন্দীই সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বীরভদ্রের আখ্যান পরিত্যাগ করে নাটকে অলৌকিকতা বর্জন ও সর্বজন পরিচিত নন্দীকে এনে নাট্যকার স্বাভাবিকতা বজায় রেখেছেন। বৈরাগী কটুকথা বলে শাস্তি পায়। ভক্ত রসিক শান্তিরামের গানে বৈরাগীর প্রতি বিদ্রূপ–

'ঠাকুর্দাদার যাগ্ দেখ্তে যেতে ধাক্কা খাই!
দয়াল শিবকে গাল্ দিয়েছেন অই বৈরাগী ভাই!'(৪/২)

পঞ্চম অঙ্কের শুরুতেও হাস্যরসাত্মক লঘু পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে নারদের উপস্থিতিতে। দধীচি, অঙ্গিরা, মরীচি, দুর্ব্বাসা প্রমুখ মুনিগণের শিবহীন যজ্ঞের নিন্দার কথা বলেও নারদ দক্ষের সন্তুষ্টিমূলক যে কথাগুলি বলেন তার গভীরে যে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ নিহিত হয়েছে তা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। দক্ষ নারদের কথায় বিগলিত হয়ে যান–

দক্ষ : আজ জানলেম তুমিই আমার যথার্থ সহোদর, পিতার আর যত মানসপুত্র তাঁরা আমার বৈমাত্র!
নারদ : যখন আমরা মাতৃগর্ভজ নই, তখন বৈমাত্র নয়, বৈপিত্র বলুন!(৫/১)

দক্ষের সামনে এরূপ উপহাস করার স্পর্ধা একমাত্র নারদের পক্ষেই সম্ভব। রসিক নারদকে আরও একবার দেখতে পেয়ে দর্শকের মনে পুলক জাগে। আত্মম্ভরিতা সর্বস্ব দক্ষ সতীর দৈন্যাবস্থা দেখে তাঁকে নিজের কন্যা বলে পরিচয় দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন। শিবের মান-অপমান বোধ কিছু নেই বলেই নিমন্ত্রণ না থাকা সত্ত্বেও সতীকে পাঠিয়েছে নিদারুণ দৈন্যবেশে, ফলে ভদ্র সমাজের কৌলীন্যে মেয়েকে স্বীকার করে নিতে তাঁর বাধে। অর্থনৈতিক বৈসম্যের ফলে শ্বশুর বাড়িতে অবহেলিত জামাইয়ের অপমানিত দিকটি পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে মিশে গেছে। মদমত্তে দর্পী দক্ষ ক্রমশ শিবের নিন্দা করতে করতে একসময় অতি নিষ্ঠুর বাক্য উচ্চারণ করেন যা সতীর জীবনে চূড়ান্ত পরিণতি ঘনিয়ে আনে। 'সতী যদি বিধবা হয়ে আজ্ আমার বাড়ী আস্তো, আমি সে ঘটনাকেও অতি শুভ ভেবে সুখী হতেম!'(৫/১)

পতি নিন্দা সহ্য না করতে পেরে সতী আত্মবিসর্জনের পূর্বে দক্ষ যে মুখে শিব নিন্দা করেছেন সে মুখের পরিবর্তে পশুমুখ হওয়ার শাপ দেন। কিন্তু পৌরাণিক আখ্যানে দক্ষের মুন্ডু নিপাত ও তার পরিবর্তে ছাগমুন্ডের প্রতিস্থাপনের সঙ্গে সতীর শাপকে যুক্ত করে দেখানো হয়নি। অবশ্য সতীর শাপকে গুরুত্ব না দিয়ে পতিভক্তির নিদর্শন রূপে দেখানোই নাট্যকারের অভিপ্রায়।

সতীর দেহত্যাগের বিয়োগান্তক দৃশ্যের মাধ্যমে নাটকের সমাপ্তি ঘটলে নাট্যকার দ্বিতীয় সংস্করণে 'হর-পার্বতীর মিলন' নামে একটি ক্রোড়অঙ্ক সংযোজন করেন সমকালীন দর্শক রুচির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি এই অঙ্কটি সম্পর্কে বলেছেন, ''বিয়োগান্ত-নাটক-প্রিয় মহাশয়েরা সে অংশটি বর্জন এবং পুনর্মিলননানুরাগী মহাশয়েরা গ্রহণ পূর্বক অভিনয় করিতে পারেন।''

এই নাটকে ১২টি গানের মধ্যে নেপথ্য সঙ্গীতই বেশি, প্রস্তাবনা সহ ৮টি। দুটি গান শান্তি পাগলার মুখে এবং ১টি নটীর মুখে ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকে গানের বাহুল্য সম্পর্কে নাট্যসমালোচক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য করেছেন-

> ''কেবল মনোমোহন নয়, মধুসূদন থেকে শুরু করে দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ প্রায় সকল নাট্যকারের পৌরাণিক নাটকেই সঙ্গীতের ব্যবহার আছে। মনোমোহনের ক্ষেত্রে সঙ্গীতের বাহুল্য অবশ্যম্ভাবী, কেননা তিনি যাত্রা এবং নাটকের মাঝামাঝি ছিলেন।''[১৭]

নাটকে গানের ব্যবহার সম্পর্কে নাট্যকার মনোমোহন বসু জোরালো পক্ষপাত করেছেন -

> ''আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, নাট্যাভিনয়ে গানের বড় আবশ্যক করে না। ইউরোপীয় রঙ্গভূমিতে নাটকাভিনয় কালে গানের অভাব দেখিয়াই তাঁহারা এই সংস্কারের বশতাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, ইউরোপীয় রুচি ও দেশীয় রুচি সম্যক্ স্বতন্ত্র পদার্থ তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। যে দেশে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্য্যেই গান না নিলে চলে না –আনন্দের কার্য্য দূরে থাকুক, মুমূর্ষু, ব্যক্তিকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইবার সময়েও সুস্বরের সঙ্গে হরিনাম সংকীর্ত্তন যে দেশে বহুকালের প্রথা . . . যে দেশে দিন ভিকারী ও রাত্ভিকারীরাও গান না গাইলে বেশী ভিক্ষা পায় না; সে দেশের হাড়ে হাড়ে যে সংগীতের রস প্রবিষ্ট হইয়া আছে, তাহাও কি আবার অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হইবে? . . . আমি এমন বলিতেছি না যে, যাত্রাওয়ালারা যেমন কথায় কথায়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর কেবল গানের আধিক্য করিয়া থাকে, নাটকেরও তদ্রূপ হউক। আমার অভিপ্রায় এই যে, স্বাভাবিক নিয়মে সংখ্যায় যতই কেন হউক না, ফলতঃ যে কয়টি গান হইবে, সে কয়টী যেন উত্তম রূপে গাওয়া হয়।''[১৮]

নাট্য চরিত্রগুলির মধ্যে দক্ষ একরৈখিক থেকেছেন, তার চরিত্রের কোন বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। প্রসূতির সন্তান বাৎসল্যের মধ্যে নাট্যকার বাঙালির মাতৃহৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করেছেন।

উমা-মেনকার সম্পর্কের প্রভাব সতী-প্রসূতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সতী চরিত্রটির মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য স্ফুরণে নাট্যকার খুব বেশি সফল হননি। দীর্ঘ সংলাপই চরিত্রটির বিকাশে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, নিতান্ত আড়ষ্ট এবং প্রাণহীন বলে মনে হয়। অশ্বিনী, অশ্লেষা ও মঘা এই তিনটি চরিত্রের ক্ষুদ্র ঈর্ষা ও অর্থহীন দম্ভের যে চিত্র নাট্যকার অঙ্কন করেছেন তা বাঙালির পারিবারিক বাস্তব জীবনের অঙ্গ বলেই নাটকে জীবন্ত রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। শান্তিরাম এই নাটকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র। এই চরিত্রটি সম্পর্কে বিভিন্ন নাট্যসমালোচক নানা মন্তব্য পোষণ করেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতো সুকুমার সেনও শান্তিরামের প্রশংসা করেছেন, ''শান্তিরাম বাহিরে গাঁজাখোর পাগল কিন্তু অন্তরে পরমহংস। সে তুচ্ছ ছড়া কাটিয়া উচ্চকথা বলে। প্লট জমিয়া উঠিয়াছে তাহার কাজের দ্বারাই।''[১৯] সুরেশচন্দ্র মৈত্র চরিত্রটি মধ্যে পরবর্তীকালে এই জাতীয় চরিত্রের পূর্বসুরিকে দেখতে পেয়েছেন, ''তিনি শান্তে পাগলা চরিত্র সৃষ্টি করে বিদূষকের সঙ্গে জ্ঞানী ব্যক্তির সমন্বয় ঘটালেন। পরবর্তীকালে 'জনা' নাটকের বিদূষক, 'সাজাহান' এর দিলদারের উপক্রমণিকা হয়ে গেল। এটি তাঁর কৃতিত্ব।''[২০] অজিতকুমার ঘোষ আধুনিক দৃষ্টিতে দেখেছেন, ''শান্তিরামও এই ছড়া ও কবিতার মধ্য দিয়া হাস্য উদ্রেক করার চেষ্টা করিয়াছে। অবশ্য আধুনিক রুচিতে তাহার অসঙ্গত অঙ্গভঙ্গী এবং অসংলগ্ন পরলাপ বিরক্তিকর।''[২১] সময়ের সঙ্গে দর্শক রুচির পরিবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু পৌরাণিক নাটক আলোচনা কালে আধুনিকের দৃষ্টিকে তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। গিরিশপূর্ব যুগে দেশীয় যাত্রাকে প্রায় নাটকের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় মনোমোহন বসু যুগোপযোগী রুচিকে উপেক্ষা করতে পারেন নি।

পার্থ-পরাজয় (১৮৮০) :

মহাভারতের অশ্বমেধপর্বের আখ্যান অনুসরণে মনোমোহন বসু 'পার্থ-পরাজয়' নাটকটি রচনা করেছেন। মহাকব্যেরর প্রেক্ষিতে নাট্যরূপান্তরকে যে ভাবে তিনি উপস্থাপন করেছেন তা মূল কাহিনির নিকটতম হলেও নাট্যকারের কল্পনা কোথাও কোথাও বিচ্যুত হয়েছে। নাটকে অর্জুন মণিপুররাজ্যে পৌঁছেছেন তৃতীয় অঙ্কে, প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের কাহিনী কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে নেই। প্রমীলার স্ত্রীরাজ্যের সংবাদ দিয়েছেন কাশরীাম। পৌরাণিক আভিধানে প্রমীলার পরিচয়– ''মহাভারতোক্ত এক নারীরাজ্যের রাণী। যুধীষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব এই নারীপ্রধান রাজ্যে উপস্থিত হলে, সাহসী রাণী প্রমীলা যজ্ঞাশ্ব ধরে রাখেন। অশ্বরক্ষক অর্জুন প্রমীলার এই দুর্জয় সাহস ও বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হন। অবশেষে প্রমীলা অর্জুনকে পতিত্বে বরণ করেন।''[২২] কাশীরাম রূপকথার আদলে পুরাণকে উপস্থাপন করতে গিয়ে অলৌকিকতার আশ্রয়ে কখনো অশ্বের লিঙ্গ পরিবর্তন করেছেন, কখনো বাঘের রূপ দিয়েছেন আবার পুনরায় অশ্বে রূপান্তরের ব্যাখ্যায় পৌরাণিক কাহিনিকে জুড়ে দিয়েছেন।

> ''জল পরশিয়া অশ্ব তুরগী হইল।
> . . .
> ব্যাঘ্ররূপ হৈল তার জল পরশিয়া।
> . . .
> ব্যাঘ্র রূপ ত্যজি অশ্ব হইল সত্বর।''[২৩]

নারীরাজ্যের বিভীষিকায় ভীতু যজ্ঞাশ্বরক্ষকের নাজেহাল অবস্থা বর্ণনার মধ্যদিয়ে নাটকের সূত্রপাত ঘটেছে। 'যুদ্ধের ভয় নয়– মর্ব্বার নয় ভূত পেত্নী দৈত্য দানার নয়– এবারে বাবা বড় বিষম দায়– মেয়ে হবার ভয়।'(১/১) 'ঘোড়া এতক্কোনে ঘুড়ী'তে পরিনত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ভীতির সঙ্গে কৌতুককর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। যজ্ঞাশ্ব রক্ষক হয়গ্রীবের অনুসন্ধানী চিৎকারের প্রত্যুত্তরে নারী সুলভ 'যাই গো' কলকণ্ঠ হাস্যরসের উপাদান মাত্র। প্রমীলার আখ্যান ভাগ কাশীরামের অনুরূপ –

''যুবতীগণের চিত্তে বাড়িল মদন।
সম্মুখে আছেন কাম কৃষ্ণের নন্দন।।
মদনে হইয়া মত্ত যতেক বনিতা।
ত্যজিল ধনুক-বাণ আর যুদ্ধ কথা।।''[২৪]

নাটকেও কৃষ্ণপুত্র মদনকে নিয়ে আসা হয়েছে। প্রমীলারাজ্যের স্ত্রী সৈন্যের সঙ্গে কোণ রণনীতি নির্ধারণ করা যায় সে বিষয়ে অর্জুন তাঁর পরামর্শ চাইছেন। কেননা সুন্দরী নারী সৈন্য দেখে তিনি খানিকটা ভয়ও পেয়েছেন। 'সকল সুন্দরি দেখি ভয় পাই মনে।' মদনের পরামর্শে সমরসজ্জা ত্যাগ করে অর্জুন মনোহর বরবেশ ধারণ করলেন। অর্জুনের প্রতি প্রমীলার রাগের পরিবর্তে অনুরাগের এই পরিকল্পনাটি মদনের পরামর্শে সার্থকও হয়েছে, 'প্রমীলা সুন্দরী হবে পরাভব/ রাগ তেজি আজি করিবে উৎসব।'(১/২)

সখী প্রফুল্লার অসাধারণ বাকবৈদগ্ধে অর্জুনের কর্তব্যবোধ কিছুটা শিথিল হয়ে চারহাত একত্রিত হয়। সম্পন্ন হয় অর্জুন ও প্রমীলার গান্ধর্ব বিবাহ। অর্জুনের ইষ্টপূজা আপাত ভদ্রতা মাত্র, তিনি মনে মনে কামার্ত হয়েই ছিলেন। প্রফুল্লার সংলাপে সে অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হয়েছে– 'এত তৃষ্ণা জানাচ্ছেন, আর এমন নির্ম্মল জল সম্মুখে ঢলঢল কর্চ্ছে, তথাপি ইষ্টপূজা।'(১/৩) কাশীরাম চারলক্ষ পদ্মিনী বাহিনীর কথা বললেও বিশেষ ভূমিকায় প্রফুল্লা চরিত্রটি নাট্যকারের মৌলিক ভাবনা। কৃষ্ণপুত্র মদনের যথাযোগ্য পুষ্পশরটি একেবারে অব্যর্থ হয়েছে। প্রমীলাবাহিনীর সমর সজ্জা বহিরঙ্গ আবরণ, অন্তরে তাঁর প্রেমের সুর বেজে উঠতে বিলম্ব হয়নি–

'আর কি হবে মিছে রণ সাজে
বিপক্ষ সেনাপতি রতিপতি নিজে;
ফুলশর হানে হৃদি মাঝে!
বর বেশে আসিছে ধনুঃশর তেজে
বিনা এই নিধুবন, এ রণ কি সাজে?'(১/৩)

কাশীরাম অর্জুনের গান্ধর্ব বিবাহের আয়োজন করেন নি, তিনি অর্জুনের কর্তব্যবোধকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সকল সুন্দরীকে তিনি হস্তিনানগরে প্রেরণ করে যজ্ঞ সমাপন হওয়ার পর তাদের মনের আশা পূরণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

''অর্জুন বলেন, শুন প্রমীলা সুন্দরী।
এখন বিবাহ তোমা করিতে না পারি।।
যজ্ঞহেতু যুধিষ্ঠির হয়েছেন ব্রতী।
অশ্ব-সঙ্গে আমি বেড়াইব বসুমতী।।''[২৫]

অশ্বমেধের ঘোড়া মণিপুর রাজ্যে প্রবেশের পূর্বে রাক্ষসরাজ ভীষণের বৃক্ষদেশে প্রবেশ করে। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দুটি গর্ভাঙ্কে রাক্ষসদের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধের কথা রয়েছে। কাশীরাম ভীষণ রাক্ষসকে বকাসুরের পুত্র বলে উল্লেখ করে পূর্বশত্রুতাকে জিইয়ে রেখেছেন, নাটকে সে ধরণের কোনো ইঙ্গিত নেই। পৌরাণিক অভিধানে ভীষণ রাক্ষসের পরিচয় বকাসুরের পুত্র বলে উল্লেখ নেই- ''বৃক্ষদেশের মায়াবী রাক্ষসরাজ। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞাশ্বরক্ষার্থী অর্জুনের হস্তে এই রাক্ষস নিহত হয়।''[২৬] নাটকে লম্বোদর মাংসবাগীশ কাশীরামের কাব্যে রাক্ষসী বলে উল্লেখিত।

''লম্বোদরী নিশাচরী সম্মুখে দেখিল।
ভীষণ রাক্ষস তারে পাঠাইয়া দিল।।
. . .
ভীষণের আজ্ঞা পেয়ে হইল মানুষী।
সৈন্যেতে প্রবেশ গিয়া করিল রাক্ষসী।।''[২৭]

নাটকে মনোমোহন বসু লক্‌লকী রাক্ষসীকে এনেছেন আমোদ সৃষ্টি করার জন্য। অশ্বমেধের ঘোড়াটিকে এখানে সবুজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে- 'এট্টা সবুজ অঙের খাসা ঘোরা ধরেচে'(২/১)। কাশীরামের পুরোহিত নাটকে অনুপস্থিত। রাক্ষস কুলপুরোহিতের নরমাংস ভক্ষণের আকাঙ্খা এখানে লক্‌লকীর মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে-

লম্বোদর : কেন লক্লকি, তোর এত খেয়েও পেট ভরে না? হরগৌরীর বরে এই বৃক্ষদেশে গাছে গাছে নিত্যই মানুষ ফলছে– রাজার কল্যাণে নরমাংসের অভাব কি?

লক্লকী : ও ঠাকুর! তারেই কি নরমাংস বলো? সে গেছো মানষের মাস খেয়ে আর আশ মেটে না– খেয়ে খেয়ে তার হ্যাক্ থু জন্মে গেছে। (২/১)

লক্লকী, লম্বোদর ও রাক্ষসরাজ ভীষণের কথোপকথনে মূলত অশ্বমেধ বাহিনীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে হনুমান ও ভীমের পরাক্রম বর্ণনার সাথে তাদের দুজনের পারস্পরিক সম্পর্কের রসালো পরিচয় দিয়েছে ভগ্নদূত- 'আবার একটা মস্ত বীরপুরুষ যাকে সকলে বল্লে ঐ বানরের দ্বাপরের সতাতো ভাই– সে একটা প্রকাণ্ড সাল গাচ উপ্ড়ে দোহেতো ঠেঙাচ্চে।'(২/১) হনুমানের কার্যক্রম কাশীরামের অনুরূপ-

''হনূমানে দেখি মনে হয় বড় শঙ্কা।
হনূমান্ হৈতে প্রভু নষ্ট হৈল লঙ্কা।।''[২৮]

নাটকে- 'বায়ু সুত্ সেই দুষ্ট হনু
লাঙ্গুলে জরায়ে তনু
ভাঙিল মস্তক জানু, হইনু পতন।'(২/১)

নাটকের তৃতীয় অঙ্কে গন্ধর্বরাজ চিত্রভানুর কন্যা চিত্রাঙ্গদা ও নাগরাজের কন্যা উলুপীর কথোপকথনে তাদের জীবনের পূর্ব বৃত্তান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্জুনের প্রতি চিত্রাঙ্গদার তির্যক অভিযোগ– 'তোমার সঙ্গেও যেমন, আমার সঙ্গেও তেম্নি ব্রজলীলা খেলে গেছেন– তুমিও যেমন, আমিও তেমন চির বিয়োগ দুঃখে জ্বলছি।'(৩/১) পূর্ববর্তী দৃশ্যে প্রফুল্লের সংলাপে যেমন দ্রৌপদী আর সুভদ্রা একই সঙ্গে তুলনীয় হয়েছেন, এখানে চিত্রাঙ্গদা ও উলুপী দুজনকে সমগোত্রে এনে নাট্যকার দৃশ্যটি রচনা করেছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে বভ্রুবাহন যখন অর্জুনের দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে কর্তব্য নির্ধারণে ইতস্তত করছেন তখন উলুপী হঠাৎই উপস্থিত হয়ে তাকে যুদ্ধের প্রেরণা যোগান। কাশীরামে উলুপীর উপস্থিতি আরও পরে, অর্জুনের আপাত মৃত্যুর পর চিত্রাঙ্গদার বিলাপ শুনে তিনি এসেছন। চিত্রাঙ্গদা ও উলুপীর

মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে নাট্যকারের এই দৃশ্যটি আবতারণার নেপথ্যে কোনো এক সত্যও থাকতে পারে। মহাভারত সমালোচক নৃসিংহ ভাদুড়ী মহাশয়ের অনুমানও তদনুরূপ–

> ''অর্জুনের একক বনবাসকালে যে দুই রমণীর সঙ্গে পরপর দেখা হয়েছিল এবং যাদের সঙ্গে অর্জুন নিজে আর কোনোও যোগাযোগ রাখেননি, সেই দুই রমনী কিন্তু নিজেদের মধ্যে হয়তো যোগাযোগ রেখেছিলেন আপন ভাগ্যের একাত্মতায়। মহাভারতের কোথাও এ কথা স্পষ্ট ভাবে লেখা নেই, কিন্তু যে দুই বহিশ্চরা রমণী দ্রৌপদী-সুভদ্রার মতো অর্জুনের অভ্যন্তরা হননি, তাদের নিজেদের মধ্যে অকালিক যোগাযোগটাও আস্বাভাবিক নয়।''[২৯]

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে দুই নারীর সঙ্গে অর্জুনের পূর্ব সম্পর্কের টানাপোড়নের দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে। উলুপীর বেদনাবিধুর সংলাপ– 'আমার কথা, ভগ্নি, লোকালয়ে বলবার নয়– সেধে কেঁদে বিবাহ, একনিশি মাত্র মিলন; তোমার কাছে বরং বৎসর কেটে গেছে!' তার একমাত্র পুত্র ইরাবান কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যুর মতো বীরত্ব দেখিয়ে প্রাণ বিসর্জনের স্মৃতি আকড়ে দুঃখিনী মাতার মতো যে বিরহী উলুপীকে নাটকে দেখা যায় মহাভারতের উলুপীর মধ্যে সেই দুর্বলতা নেই।

> ''তিনি যথেষ্ট কঠিন প্রকৃতির রমণী। রমণী হয়েও অর্জুনের কাছে তিনি স্বয়ং রতি-প্রর্থনা করেছিলেন এবং প্রর্থনা পুরণ হতেই একরাত্রির সহবাসের পর তিনি স্বয়ং তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিলেন স্বস্থানে। . . . এতটাই তাঁর ক্ষমতা যে, তিনিই প্রথম অর্জুনের দ্বাদশবার্ষিক ব্রহ্মচর্যের ব্রত বুভুক্ষু তাড়নার ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন; যুক্তি স্থাপন করেছেন নিজের পক্ষে, দ্রৌপদীকে ছোট না করেও।''[৩০]

স্বাধীনচেতা অনার্য উলুপীকে মধ্যবয়সী বাঙালি মাতার মতো পুত্রের মঙ্গল কামনায় যুদ্ধকে শান্তি জলে স্নাত করেছেন। রাজ্যের অনেক সংবাদই তিনি রাখেন। যজ্ঞাশ্বটি যে পাণ্ডবদের তাঁর এই অনুমান অভ্রান্ত। অশ্বটিকে ধরা বভ্রুবাহনের উচিত কার্য হয় নি বলে তার অভিমত। কিন্তু অশ্বের মস্তকে 'বীবের বেটা বীর থাক তো ঘোড়া ধর' –পাণ্ডদের এই দম্ভোক্তি

বভ্রুবাহনের পক্ষে শ্লাঘাজনক বলেই তিনি ঘোড়াটিকে বন্দি করেছেন। এক্ষেত্রে উলুপী বিপরীত যুক্তি দেখিয়েছেন -

> 'কিন্তু বাপু, তাঁদের সে দর্প তো পুত্রের উদ্দেশে নয়– সে কেবল অন্যান্য রাজাদের জন্য লেখা! তাতে বিরোধী হওয়া কি সুপুত্রের কাজ? তুমি যদি হস্তিনাতেই থাক্তে, তবে কি সেই দর্পকারীদের মধ্যে তুমিও একজন হতে না?'(১/৩)

উলুপী ও চিত্রাঙ্গদা দুজনেই পুত্রকে বুঝিয়ে পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে যজ্ঞাশ্ব ফেরত পাঠানোর কথা বললেন। যদি অর্জুন তাঁকে পুত্র বলে চিনতে না পারেন তাহলে বিনয় বচনে নিজের পরিচয় দেওয়ার কথা বললেন। তারপর মাতাদের কথাও উল্লেখ করতে মনে করিয়ে দিলেন– 'তখন একবার দুঃখিনী জননীদের কথা বলতেও ভুলো না–ইঙ্গিতে বলো।'(৩/১) ইঙ্গিতে মাতাদের কথা উল্লেখ করার মধ্যদিয়ে স্বামীহীনা দুঃখিনী নারীর মর্ম বেদনা নাট্যকার তুলে ধরেছেন। বভ্রুবাহন ক্ষত্রিয় পিতার কাছে ক্ষাত্রোচিত ভাবেই নিজের পরিচয় দেওয়ার পক্ষে যুক্তি স্বরূপ রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে লবকুশের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। কাশীরামের আখানেও তুলনাটি রয়েছে– ''ধন্য লব-কুশ রাখিল পৌরুষ।''[৩১] নাটকে উলুপী পুত্রকে নিরাপদে রাখার জন্য যুক্তিখণ্ডন করেন এই ভাবে, লবকুশ রামচন্দ্রকে পিতা বলে জানতেন না, অথবা জেনে থাকলেও রামচন্দ্র যে বিনাদোষে সীতাকে বনবাসে পাঠালেন সেজন্য তাঁদের ক্ষোভ জন্মানো স্বাভাবিক। এই আলোচনায় মাতৃপক্ষেরই জিত হলো।

মহাভারতে উলুপী ঠিক তখনই এসে উপস্থিত হন যখন অর্জুনের কাছে অপমানিত কিংকর্তব্যবিমূঢ় বভ্রুবাহনকে যথোচিত উপদেশ দানের প্রয়োজন হয় -

> ''এক্ষণে তুমি আমার বাক্য শ্রবণ ও তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরমধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে। তোমার পিতা যখন যুদ্ধার্থী হইয়া তোমার আধিকারমধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছেন, তখন উঁহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার অবশ্য কর্তব্য।''[৩২]

উলুপী তাকে যুদ্ধ করার জন্যই প্রণোদিত করেন–''যুধ্যস্বৈনং কুরুশ্রেষ্ঠং পিতরং যুদ্ধদুর্মদম্।''[৩৩] নাটকে বভ্রুবাহন মাতৃবাক্য মেনে নিলেও মন থেকে যেন মানতে পারছিলেন না। কাশীরামের আখ্যানে বভ্রুবাহন দ্বিধান্বিত মনে মাতা চিত্রাঙ্গদার কাছে উপায় জানতে চেয়েছেন –

''জন্মদাতা সঙ্গে মোর নাহি পরিচয়।
চরণ পূজিব তাঁর করিনু নিশ্চয়।।
না জানিয়া যজ্ঞ-অশ্ব ধরিলাম আমি।
কি করি উপায় এবে কহ মাতা তুমি।।''[৩৪]

যজ্ঞাশ্ব ধরার পরেও বভ্রুবাহন যে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি –এ নিয়ে অর্জুন ও মদনের হাস্যালাপ পাণ্ডবদের ক্ষাত্রোচিত স্বাভাবিক ধর্মেই বিদ্রুপের বিষয়। মাতৃআজ্ঞায় যুদ্ধ না করার কথায় মদনের ব্যঙ্গ, 'মাতৃ-আজ্ঞা! –এ নিতান্ত নূতন হেতু! অথবা নিতান্তই অহেতু! মাতৃ-আজ্ঞাতে ক্ষত্রিয় সন্তান যুদ্ধ ত্যাগ করে পায় ধরে যজ্ঞাশ্ব প্রত্যর্পণ করে, মণিপুরেই এর প্রথম দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল!'(৩/২)

বভ্রুবাহন অর্জুনের কাছে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে তাঁকে ঔরসদাতা বলে উল্লেখ করলে অর্জুন তা আস্বীকার করেন। এখানে অর্জুন চরিত্রের উপর দুষ্মন্তের খানিক প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। কাশীরাম এই প্রত্যাখ্যান আরো রসালো ভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি বভ্রুবাহনকে পদাঘাত পর্যন্ত করেছেন –

''কাহারে বলিস পিতা নটীর তনয়।
অভিপ্রায়ে বুঝি তব নাহি লজ্জা ভয়।।''[৩৫]

নাট্যকার সুমার্জিত ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেও অর্জুনের হৃদয়ে বাৎসল্য রসের সন্ধান করেছেন -

'আপনার এই সুকোমল অথচ সুবীরযোগ্য মুখশ্রী দেখে আমার হৃদয় অনির্ব্বচনীয় বাৎসল্য-রসে আপ্লুত হচ্ছে– সেই অমৃত রসের সুখাস্বাদের জন্য মনঃপ্রাণ কি জানি কেন এত ব্যগ্র

হচ্ছে– সে সুখে উভয়েই সুখী হতে পার্ত্তেম, কিন্তু আপনি অসম্ভব বাক্যে সেই সম্ভব সুখকেও বিনষ্ট করে দিচ্ছেন!'(৩/২)

বভ্রুবাহন অর্জুনকে পিতা বলে জানেন বলেই প্রতিস্পর্ধী কোনো কাজ করতে পারছেন না। অর্জুনের চরণেই আত্মসমর্পণ করে চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে তাঁর বিবাহের স্মৃতিকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। অর্জুন স্বীকার করলেন বটে মহেন্দ্রনগরে গন্ধর্বপতি চিত্রভানু রাজার কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল কিন্তু মণিভদ্রপুরের রাজতনয়ার সঙ্গে নয়। চিত্রভানুর উপরাজধানী মহেন্দ্রনগরী, মূল রাজধানী মণিপুর। স্থান পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে নাট্যকার বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। অর্জুন বিবাহ সম্ভব বলে মেনে নিলেও বভ্রুবাহনকে তাঁর ঔরসজাত সন্তান বলে অস্বীকার করেন। পুত্র অভিমুন্যের তুলনায় বভ্রুবাহনের তুচ্ছতা উল্লেখ করে অর্জুনের ক্ষাত্রোচিত উচ্চারণ, 'আমার ঔরসজাত পুত্র হলে কি অগ্রে অশ্ব ধরে বিনা যুদ্ধে পায় ধরে দিতে আসে?'(৩/২)

কাশীরামের আখ্যানে অর্জুন বভ্রুবাহনকে জারজ সন্তান বলে পদাঘাত করতেও কুণ্ঠিত নন, বভ্রুবাহনও কবিগানের মতো আসর জমানো প্রত্যুত্তর দেন –

''জারজ বলিয়া তুমি গালি দিলে মোরে।
যে জন জারজ তাহা বিদিত এ সংসারে।।
আমার মাতাকে নটী বলিলে আপনি।
কোন্ কর্ম্ম কৈল কুন্তী তোমার জননী।।
কুমারী কালেতে কর্ণে করিল প্রসব।
না জানিয়া নিজ কথা করহ গৌরব।।
কাহার ঔরসে জন্ম বাপ বল কারে।
পঞ্চভাই পঞ্চপিতা বিদিত সংসারে।।''[৩৬]

নাটকের মার্জিত ভাষায় কাশীরামের উত্তেজনা নেই কিন্তু বভ্রুবাহনের শানিত সংলাপে ক্ষত্রিয়রীতির তীব্র সমালোচনা রয়েছে, 'কি আশ্চর্য্য, এক যুদ্ধ-বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ বলে বলগর্বিত ব্যক্তিরা মনে করেন, তাঁরা সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ–তাঁরা যা কিছু কর্ব্বেন, যা কিছু বল্‌বেন, তা অতি কদর্য্য হলেও সুশ্রী– অতি অন্যায্য হলেও পরম ন্যায্য!'(৩/২) বভ্রুবাহন দীর্ঘ সংলাপে যা ব্যক্ত করতে চাইলেন তা আধুনিক কালের নাট্যকার মনোজ মিত্রের 'যা নেই ভারতে' নাটকের একটি মাত্র সংলাপেই প্রকাশ পেয়েছে– ''অশ্বমেধ কোনও যজ্ঞই নয়। ওটা অবাধ লুণ্ঠনের একটি শাস্ত্রীয় পন্থা মাত্র।''[৩৭]

বভ্রুবাহনের মধ্যে ক্ষাত্রোচিত দাবানল জ্বলে উঠতে কিছুটা সময় লেগেছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ বভ্রুবাহনের চারিত্রিক দুর্বলতাকে শ্লেষ বাক্যে জর্জরিত করেছেন, ''তোমাতে কিছুমাত্র পুরুষকার নাই। তুমি স্ত্রীজাতির ন্যায় নিতান্ত অসার।''[৩৮] নাটকে মাতা চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কে অপমানজনক কথায় বিদ্ধ হয়ে পাণ্ডবগৌরবাভিমান ধূলিসাৎ করার লক্ষ্যে তিনি অর্জুনের চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করেন। নাটকে ব্যবহৃত নেপথ্য সঙ্গীতটি যুদ্ধের আবহ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে –

'. . .মহা মহা রথী অগন্য, যতেক সৈন্য
চুম্বিয়ে ধরা সবে যবে লুটিবে
পুত্র বলি তবে চিনিবে!'(৩/২)

চতুর্থ অঙ্কে পিতা-পুত্রের মিলনের সম্ভাব্য উত্তেজনায় উলুপী উৎসবের আয়োজন করছেন কিন্তু চিত্রাঙ্গদার মন যেন আশ্বস্ত হচ্ছে না। অজানা আশঙ্কায় তাঁর মন বিরূপতার দিকেই সায় দিচ্ছে, নানা রকম দুর্লক্ষণ তাঁর চোখে পড়ছে– দক্ষিণ চোখ কাঁপছে, দক্ষিন বাহু স্পন্দন করছে, কাক পেঁচা শিয়াল অমঙ্গল আশঙ্কায় আর্তনাদ করে উঠছে। চিত্রাঙ্গদা ও উলুপী দুজনেই ব্যাগ্র ভাবে বভ্রুবাহনের পরিষদ সুধীরের কাছে যুদ্ধের বার্তা জানতে চেয়েছেন।

চিত্রাঙ্গদা ও উলুপী : সুধীর! শীঘ্র বল, তোমার মহারাজের প্রাণ তো আছে?

সুধীর : প্রাণ আছে, কিন্তু মান গেছে।

উলুপী : মান গেছে? কিসে?

সুধীর : বচনে, রণে নয়! সভার মাঝে, সমর ক্ষেত্রে নয়– ক্ষত্রিয়ের প্রকৃত কাজে নয়। (৪/১)

উলুপী সমস্ত লজ্জার মাথা খেয়ে স্বয়ং অর্জুনের কাছে যেতে উদ্যত হলেন। তিনি অর্জুনকে পূর্বের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ঔরসের যোগসূত্র স্থাপনে উদ্যোগী হন– 'অকাট্য প্রমাণে তাঁরে অপ্রতিভ করে বৎস বভ্রুবাহনকে এখনি পিতৃক্রোড়ে বসাব।'(৪/১) লক্ষণীয় পুত্রকে ছাপিয়ে যেতে চাইছেন মাতা উলুপী। সভার মাঝে পুত্রের পরাজয় তাঁর স্বীকৃতিকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। তাই উলুপীকে অত্যন্ত তৎপর হতে দেখা যায়। শুধু মাতা বলে নয় নারীত্বের অবমাননার প্রতিবাদে এই নাটকে উলুপী চরিত্রটি বিশিষ্ট মাত্রা পেয়েছে। উলুপী ও চিত্রাঙ্গদা ক্ষত্রিয় কন্যা নন বলে সুধীর তাঁদের সমলোচনা করেছেন। অর্জুনও তাঁর পুত্রের বিনয় দেখে আশাহত হয়েছেন। বভ্রুবাহন ক্ষত্রিয়ের পুত্র হয়েও ক্ষত্রিয় পিতাকে যেভাবে অভ্যর্থনা করতে হয় তা দেখাতে পারেন নি। কাশীরামের টিপ্পনী–

''আগে গর্ব্ব করি মোর ধরিলেক হয়।
ভয় পেয়ে শেষে বলে তোমার তনয়।।
এ যদি হইত মম ঔরস নন্দন।
যুদ্ধবিনা অশ্ব না করিত সমর্পণ।।''[৩৯]

চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে হাস্যরস পরিবেশনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। মূল কাহিনির সঙ্গে আপাত সংযোগহীন মনে হলেও এই দৃশ্যে ব্যাধপত্নীর ব্যঙ্গটি অর্থবহ। 'বব্বরভাঁওনের নোকের' ভয়ে ঘনো ও রণো জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করেছে। পলায়নপর অর্জুন সৈন্যদের কথায় যুদ্ধ সংবাদ কিছুটা পাওয়া গেল মাত্র। বভ্রুবাহন ও অর্জুনের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে তির্যক রসিকতা করেছেন ব্যাধপত্নী ঝক্ড়ী ও ব্যাধপুত্র ছনো –

ঝক্ড়ী : রাজার অনেক কেলে এট্টা বাবা এয়েছে– তারে হরিণ মাস খাওয়াবে।

ছনো : রাজার এ বাবা এদ্দিন্ কোথায় ছিল মা?

ঝক্‌ড়ী : চুলোয় ছিল! রাজা রাজ্‌ড়ার কাণ্ড, তারাই জানে। কেউ বলে বাবা, কেউ বলে নয়– ভয় পেলে, আর বাবা বল্লে!(৪/২)

চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে পাণ্ডব পক্ষে বৃষকেতু ও অন্যান্য বীর সেনাদের সমাগম ঘটে। মূল মহাভারতে পিতা-পুত্রের মধ্যেই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ, কিন্তু কাশীরাম পবনপুত্র থেকে শুরু করে বৃষকেতু পর্যন্ত অনেক বীরকেই এই যুদ্ধে টেনে এনে বিপর্যস্ত করেছেন। বৃষকেতু বভ্রুবাহনের সঙ্গে যুদ্ধে অত্যুসাহী হলেও অর্জুনের বংশধরদের মধ্যে একমাত্র বৃষকেতুই জল-পিণ্ডের অবলম্বন বলে অর্জুন চিন্তিত। তাঁর পরাজয় দেখে অর্জুনের উক্তি, 'আর কি কেউ রথী নাই যে অগ্রসর হয়? ব্যাঘ্রমুখে বালককে রেখে সকলেই নিশ্চিন্ত রয়েছে– দেখছি আমাকেই যেতে হলো!'(৪/৩) বস্তুতঃ অর্জুন বভ্রুবাহনকে বাঘের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর বীরত্বকে স্বীকৃতি দিলেন। তাঁর শৌর্যবীর্য যুদ্ধকৌশল দেখে নিজের বীরত্বপূর্ণ অতীতের স্মৃতি; যেভাবে খাণ্ডব দাহন করেছিলেন –সে সব কথা অর্জুনের মনে পড়ে। নিজের সন্তানকে চিনে নেন আপন সত্তার সঙ্গে সাদৃশ্যে, যুক্তি তর্কের মাধ্যমে নয়। মৌনস্বভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ অর্জুনের মধ্যে দেখা যায় বাচালতা। তিনি বুঝতে পারেন হতশ্রদ্ধায় তিনিই বভ্রুবাহনকে অপমানিত করে উত্তেজিত করেছেন। সম্মুখ সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন। মূল মহাভারতে এই অংশে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি নেই। তাঁকে স্মরণ করেছেন কাশীরাম –

''হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো ওহে ভগবান।
বিষম সংসার ঘোরে কর প্রভু ত্রাণ।।
আইস কমলাপ্রিয় শীঘ্র মণিপুরে।
বভ্রুবাহনের যুদ্ধে রক্ষা কর মোরে।।''[৪০]

চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কের শুরুতে কাশীরামের অনুসরণে হরি ভক্তির বিচ্ছুরণ ঘটেছে। নেপথ্যে ঘটে যাওয়া যুদ্ধের সংবাদ অর্জুন ও হয়গ্রীবের সংক্ষিপ্ত সংলাপে সমগ্র বাহিনীর সেনাদের বিপর্যস্ত অবস্থার কথা প্রকাশিত হয়।

অর্জুন : হয়গ্রীব! কি সম্বাদ?

হয়গ্রীব : প্রভু! সব নষ্ট হলো– অগণিত সৈন্য সামন্ত, রথরথী, হয় গজ নিমিষে নিমিষে পতন হচ্ছে– কেউ রক্ষক নেই– কেউ তাদের নায়ক নেই–

অর্জুন : কেন, মদন?

হয়গ্রীব : অচেতন!

অর্জুন : মধ্যম দাদা?

হয়গ্রীব : তদবস্ত!

অর্জুন : সাত্যকি?

হয়গ্রীব : পরাস্ত–আহত–শিবিরে নীত–মৃতপ্রায়!

অর্জুন : অন্যান্য রাজগণ?

হয়গ্রীব : ভূ-লুণ্ঠন!

অর্জুন : সাম্ব?

হয়গ্রীব : শ্বাসকণ্ঠ!

অর্জুন : বৃষকেতু?

হয়গ্রীব : হা প্রভু! তিনি কি আর অস্ত্র ধর্বেন?(৪/৪)

সকল বীরের পরাজয়ের পর অর্জুন নিজেই বভ্রুবাহনের সম্মুখীন হন। তাঁর মনে বীরত্ব ও বাৎসল্যের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠেনি, যেমনটি দেখাগেছিল ভীষ্মের ক্ষেত্রে। অর্জুনের আপাত মৃত্যুর কারণ হিসেবে গঙ্গার অভিশাপকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি বরং কৃষ্ণকে দেখার জন্য বভ্রুবাহন জাহ্নবীবাণ প্রয়োগ করলেন বলে নাটকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কাশীরাম অলৌকিকতার মায়া জাল বিস্তার করলেও কৃষ্ণের মণিপুরে আগমনের নেপথ্যে কুন্তীর দুঃস্বপন জনিত তাড়না ক্রিয়াশীল। অর্জুন সম্মুখ সমরে প্রাণপণে কৃষ্ণকে স্মরণ করছেন, যিনি পূর্বে বহুবার তাঁকে রক্ষা করেছেন।

পঞ্চম অঙ্কে হস্তিনার রাজ অন্তপুরের নারীদের উদ্বেগ দৃশ্যায়িত হয়েছে। কাশীরাম শুধুমাত্র কুন্তীর কথাই বলেছেন, নাটকে অন্যান্য মহিষীদের দুশ্চিন্তার কথাও রয়েছে। সন্তানের জন্য কুন্তীর স্বাভাবিক উৎকণ্ঠার সঙ্গে নাট্যকার তাঁর অহংবোধের মাত্রাকেও যুক্ত করেছেন, নকুল সহদেবের ভাবনা কুন্তীর মনে উদয় হতো কিন্তু ভীমার্জুনের কথা এক নিমিষের তরেও তাঁর মনে হয়নি, দর্পহারী কি সেই দর্পচূর্ণ করলেন? মঙ্গল কাব্যের মতো দীর্ঘ সংলাপে বিগত দিনের সকল কথা এক এক করে উচ্চারণ করে কুন্তী বিলাপ করেন। নাটকে সুভদ্রাও একই রকম দুঃস্বপ্ন দেখে আতঙ্কিত। তাঁর হাতের কঙ্কন খুলে পড়েছে, যে কঙ্কন কেউ টেনেও খুলতে পারত না, ডান চোখ ও দক্ষিণবাহু কাঁপছে। চারিদিকে কেবল রোদন ধ্বনি, কাকের রব, দিবাভাগে শিবার ডাক –সবই অমঙ্গল সূচক। প্রমীলার উদ্বিগ্নতার দৃশ্যাঙ্কনে নাট্যকারের কাব্যিক ভাষা লক্ষণীয়–

> ‘তরুণ অরুণ প্রায়, সীমন্তে সিন্দুর হয়,
> শোভা পায়, নিত্য নিত্য হায়, শোভা পায়,
> আজি সে সীমন্ত শূন্য, হৈমবতী অপ্রসন্ন,
> নাহি সে সিন্দুরের চিহ্ন– কে যেন মুছে দিয়েছে।’(৫/১)

প্রমীলা ও প্রফুল্লা তাদের পদ্মিনীসেনা নিয়ে অনুসন্ধানে যেতে উদ্যত হয়েছেন। চিত্রঙ্গদার প্রতি সুভদ্রার তির্যক ব্যঙ্গোক্তির নেপথ্যে নাট্যকার সতিন বিদ্বেষের স্ফুলিঙ্গ ঝরিয়েছেন -

> ‘তিনি তথায় থাক্তে প্রাণবল্লভের প্রাণ নিয়ে তবু এই বিপদ? এ যে অসম্ভব! গন্ধর্বকন্যারা কি এত মায়াবিনী? স্বামী-সেবনে বঞ্চিতা বলে রিষের বিষ কি গন্ধর্ব লোকে এত প্রখর? গন্ধর্ব্বীরা অভিমানিনী হলে কি স্বামীঘাতিনী হয়?’(৫/১)

নাটকে চিত্রাঙ্গদা পুত্র বভ্রুবাহনের বীরত্বে দর্পী বলে নিজেকে আত্মধিক্কার দিয়ে বিলাপ করেছেন, ‘রে পুত্রপক্ষপাতী পাপ প্রাণ! পুত্রের নানাগুণে মুগ্ধ আর সেই অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে বড় আশা করেছিলি, রাজাধিচক্রবর্ত্তী রাজার মা হবি।’(৫/২) শোকাকুল হয়ে পুত্র বভ্রুবাহনকেও তিনি নিন্দা করেছেন।

কাশীরাম : ''ওরে পুত্র কি কহিলি অমঙ্গল কথা।

কেমনে কাটিলি তুই জনকের মাথা।।''[৪১]

কালীপ্রসন্ন সিংহে চিত্রাঙ্গদা অর্জুন নিধনের জন্য স্পষ্ট ভাষায় উলুপীকে দায়ী করেছেন -

> ''তুমিই ঐ মহাবীরের নিধনের মূলীভূত কারণ। তুমি পরামর্শ না দিলে আমার পুত্র কখনই ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত না। এই ত তুমি পতিব্রতা! এই তোমার ধর্ম্মজ্ঞান! আজ তোমার নিমিত্তই তোমার স্বামী নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। . . . উনি বহুসংখ্যক কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তুমি উহার প্রতি অনাদর করিও না।''[৪২]

নাটকে উলুপী চরিত্রকে যুদ্ধবিরোধী রূপে উপস্থাপন করায় তাঁর উপর দোষারোপ করার অবকাশ নেই। অর্জুনের দেহ ঘিরে চার নারী– সুভদ্রা প্রমীলা চিত্রাঙ্গদা ও উলুপীর একত্র সমাবেশ নাটকে দেখা যায়। মূল আখ্যানে সুভদ্রা ও প্রমীলার প্রসঙ্গ নেই। সুভদ্রার দীর্ঘ বিলাপ, গাণ্ডীবের গুণ গলায় পেঁচিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা নাটকীয়তা পূর্ণ। অর্জুনের প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য সঞ্জীবনী মণি উলুপীর আঁচলে বেঁধে দিয়েছেন নাট্যকার। কিন্তু মণির কার্যকারীতাকে সীমায়িত করেছেন, 'সামান্য নর নারীর হস্তে এ মণি একখণ্ড সামান্য প্রস্থর বৈ আর কিছুই না– কেবল মহাপুরুষের হস্তস্পর্শেই এই মণি আশ্চর্য্য গুণ-প্রসবিনী– মৃত সঞ্জীবনী হয়।'(৫/২) নাটকে ভক্তিরস সংযোগ করার জন্য নাট্যকার শ্রীকৃষ্ণকে টেনে নিয়ে এলেন, মণির অত্যাশ্চর্য গুণকে মহাপুরুষের স্পর্শের শর্তে কার্যকরী করলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহে এই মণি স্বতস্ফুর্ত ভাবেই ক্রিয়াশীল। উলুপী সরাসরি বভ্রুবাহনকে বলেছেন, ''তুমি এই মণি গ্রহণপূর্ব্বক তোমার পিতার বক্ষঃস্থলে স্থাপন কর; তাহা হইলে উঁহাকে পুনরুজ্জীবিত দর্শন করিবে।''[৪৩]

মণি সংগ্রহ করা প্রসঙ্গে কাশীরাম বিস্তর আখ্যান ফেঁদেছেন। নাগরাজের কাছ থেকে মণি আহরণের জন্য বভ্রুবাহনের যুদ্ধ, নাগরাজের পুত্রদ্বয়ের দ্বারা বৃষকেতু ও অর্জুনের ছিন্নমুন্ডু চুরি

করে পাতালে পলায়ন, কৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতায় মস্তক উদ্ধার ও সৈন্যসামন্ত সহ সকলের পুনর্জীবন প্রাপ্তি রূপকথার মতো অসম্ভবতা নাটকে বর্জিত হয়েছে। কাশীরাম যেমন অবলীলাক্রমে মস্তক ছেদন করতে পারেন আবার এক ফুয়ে সকলকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন বলেই তাঁর সীমাহীন কল্পনা পাঠকশ্রোতাকে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিভুবনে অনায়াসে নিয়ে যায়। মুন্ডুহীন ছায়াবাজির ভেলকি দেখিয়ে বীরের মনেও ভীতি সঞ্চার করার যাদুকাঠি কাশীরামের মুষ্ঠিগত–

''মুন্ডহীন ছায়া বীর দেখি আপনার।
চিন্তান্বিত হইলেন পাণ্ডুর কুমার।।''[৪৪]

নাটকে অর্জুন জীবন প্রাপ্তির পর যুদ্ধক্ষেত্রে চার রমনীকে উপস্থিত দেখে বিস্মিত হয়েছেন। সুভদ্রার কাছে হস্তিনার কুশল জানতে চাওয়ার মধ্যে যতটা না ব্যকুলতা প্রকাশ পেয়েছে তার চেয়ে বেশি প্রকটিত হয়েছে নাটকের সুখ সমাপ্তির প্রবণতা–

অর্জুন : হস্তিনার কুশল? মহারাজ তো ভাল আছেন?
সুভদ্রা : (স্বগত) হায়! দাসীর কথা ভুলে গেছেন!
অর্জুন : এ কি? প্রিয়তমা প্রমীলা যে এখানে?
সুভদ্রা : (স্বগত) নব মহিষী–আমরা পুরাতন দাসী।(৫/২)

সকলের সুখ মিলন দেখিয়েই নাটকের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু মহাভারত এই মিলন দৃশ্যের পরও ত্রিভুবন জয়ী অর্জুনের পরাজয়ের একটি ব্যাখ্যা দেয়– ''আপনি ভারতযুদ্ধে অধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক মহাত্মা ভীষ্মকে নিপীড়িত করিয়া যে পাপসঞ্চয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে বভ্রুবাহনের হস্তে পরাজিত হওয়াতে আপনার সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ হইল।''[৪৫] নাটকের উদ্দেশ্য বভ্রুবাহনের বীরত্বের প্রেক্ষিতে অর্জুনের কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ। ফলে অর্জুনের পরাজয়ের কারণ নাট্যকার সচেতন ভাবেই বর্জন করেছেন বলে মনে হয়।

চতুর্থ অঙ্ক ছাড়া বাকি সব অঙ্কের শেষে একটি করে গান রয়েছে। অধিকাংশ দৃশ্যের সমাপ্তিতেও গান মাধ্যেমে ঘটেছে। এছাড়াও নাটকের পরিশিষ্ট অংশের ১৭টি গান নাটক প্রযোজনার সময় সংযোগের কথা ভেবে নাট্যকার রচনা করেছেন। বস্তুত মনোমোহন বসু নাটকে গানের আধিক্য সম্পর্কে বিস্তৃত ভাষণ তিনি সতী নাটকের ভূমিকায় উল্লেখও করেছেন। মহাভারতের প্রেক্ষিতে এই নাটকে সংযোজিত অংশের প্রাসঙ্গিকতায় দেখা যায় মনোমোহন বসু কাহিনির পর কাহিনি জুড়ে দীর্ঘ পালা রচনা করেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খন্ড), পৃ: ৩৫২-৩৫৩, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৯

২. প্রবোধচন্দ্র বসু : 'কবিবর মনোমোহন বসু' (সংক্ষিপ্ত জীবনী), পৃ: ৫৬৯, নাট্য মন্দির, ১৩১৮

৩. মনোমোহন বসু : 'বক্তৃতামালা মনোমোহন বসু', দ্বিতীয় বার্ষিক চৈত্র মেলার বক্তৃতা, ১৭৮৯

৪. সুনীল দাস (সম্পা.) : 'মনোমোহন বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরি', পৃ: ১৯২ সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮১

৫. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (২য় খন্ড), পৃ: ২৮০, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

৬. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ, পৃ: ৮২৬, ঐ

৭. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ, পৃ: ৮২৭, ঐ

৮. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ, পৃ: ৮২৬, ঐ

৯. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী : 'মহাভারতের লঘু গুরু', পৃ: ২০১, পত্রলেখা, প্রথম প্রকাশ ২০১২

১০. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ১১, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ- ২০১৩

১১. কাশীরাম দাস : ঐ

১২. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খন্ড), পৃ: ৩৫৬, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৯,

১৩. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খন্ড), পৃ: ১১১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৪১৪

১৪. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (২য় খন্ড), পৃ: ৮২৭ তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

১৫. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ, পৃ: ৪৬১, ঐ

১৬. সুধীরচন্দ্র সরকার : 'পৌরাণিক অভিধান'(সংকলিত), পৃ: ২০৭, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, দশম সংস্করণ, ১৪১৮

১৭. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক', পৃ: ৯৮, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ' তৃতীয় সংস্করণ, ২০১১

১৮. মনোমোহন বসু : জাতীয় নাট্যসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কালে মনোমোহন বসুর বক্তৃতা, মধ্যস্থ, পৌষ, ১২৮০

১৯. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (৩য় খন্ড), পৃ: ১৩৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৪১৪

২০. সুরেশচন্দ্র মৈত্র : 'বাংলা নাটকের বিবর্তন', পৃ: ৩২০, রত্নাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০

২১. ড. অজিতকুমার ঘোষ : 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', পৃ: ১১৫, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০

২২. সুধীরচন্দ্র সরকার : 'পৌরাণিক অভিধান'(সংকলিত), পৃ: ৩১২, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, দশম সংস্করণ, ১৪১৮,

২৩. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ:১০৯১ দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ- ২০১৩

২৪. কাশীরাম দাস : ঐ, পৃ:১০৯২, ঐ

২৫. কাশীরাম দাস : ঐ, পৃ: ১০৯৩, ঐ

২৬. সুধীরচন্দ্র সরকার : 'পৌরাণিক অভিধান'(সংকলিত), পৃ: ৩৯০, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, দশম সংস্করণ, ১৪১৮

২৭. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ:১০৯৪, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ- ২০১৩

২৮. কাশীরাম দাস : ঐ, পৃ: ১০৯৫, ঐ

২৯. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী : 'মহাভারতের অষ্টাদশী', পৃ: ৫৮৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৪

৩০. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী : 'মহাভারতের অষ্টাদশী', পৃ: ৫৮০, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৪

৩১. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ১১০০, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ- ২০১৩

৩২. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (২য় খন্ড), পৃ: ১১৮৬, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

৩৩. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী : 'মহাভারতের অষ্টাদশী', পৃ: ৫৮৯ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৪

৩৪. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ১০৯৭, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ- ২০১৩

৩৫. কাশীরাম দাস : ঐ, পৃ: ১০৯৮, ঐ

৩৬. কাশীরাম দাস : ঐ, পৃ: ১০৯৯, ঐ

৩৭. মনোজ মিত্র : 'রামায়নী মহাভরতী' পৃ: ১০০, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯

৩৮. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (২য় খন্ড), পৃ: ১১৮৬, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

৩৯. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ, পৃ:১০৯৮, ঐ

৪০. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ, পৃ:১১০৩, ঐ

৪১. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ, পৃ:১১০৪, ঐ

৪২. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ, পৃ: ১১৮৭, ঐ

৪৩. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ, পৃ:১১৮৮, ঐ

৪৪. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ:১১০২, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ- ২০১৩

৪৫. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' পৃ: ১১৮৯, (২য় খন্ড), তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮